জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের স্বরূপ সন্ধান

ঝুমুর আহমেদ*

Abstract

Rabindranath Tagore is a sovereign scholar of Bangla music. The uniqueness of his songwriting enriched the stream of Bangla songs. Hindustani classical, Western, and folk music, kirtana (song of praise), and different provincial trends influenced Rabindranath's songs at his younger age. His songs gradually became distinctive by avoiding those influences in the course of the growing maturity of his musical insight. His mature songs fulfilled the listeners' craving for simplicity and depth in place of his earlier songs' complex tunes and insightful lyrics. In this essay, we shall observe the profile of Tagore's songs of his mature age and how his songs have been transformed into an aesthetic form from the emotive state. Ten representaive songs have been selected as a sample while doing this research. Through textual analysis and comparative research methodology, this research identified the simultaneous state of his simple and unrhetorical creation and the desire for impersonation in the astute Tagore songs.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত, পরিণত বয়সের গান, রূপাকুলতা, সারল্য

ভূমিকা

সর্বজনমান্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) বাংলা গানের সার্থক রূপকার, অনন্যসাধারণ আলোকবর্তিকা। তাঁর গীতরচনার প্রাতিস্বিকতা বাংলা গানের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে। শিল্পরসবোদ্ধা হবার কারণে তিনি তাঁর নানান রচনায় শিল্পের নানান বিষয়ের পাশাপাশি নিজের গান প্রসঙ্গেও তথ্য দিয়ে গেছেন। উনিশ শতকের সমসাময়িক সংগীতকারগণের সঙ্গে তাঁর একটা প্রধান ব্যবধান ছিল এই যে, তিনি তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দিয়ে গেছেন, স্বরলিপি দিয়ে চিহ্নিত করে গেছেন। কারণ, নিজের গানের বিকার নিয়ে গভীর সংবেদন এবং উদ্বেগ ছিল তাঁর। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক বিবরণ এবং সংগীতচিন্তা-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি– প্রথম জীবনের গান তিনি ভাব বাৎলাবার জন্যে রচনা করেছিলেন, আর পরিণত বয়সের গানে ছিল রূপ দেবার সাধনা। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখব, পরিণত বয়সে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ কী, কেমন করে রবীন্দ্রনাথের সেই রূপ দেবার সাধনা বা রূপাকুলতা সেইসব গানে ফুটে উঠেছে।রবীন্দ্রনাথের *সংগীতচিন্তা*, *গীতবিতান* ও *স্বরবিতান*সমূহ এই গবেষণায় 'আকর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণা-সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতের অনন্য স্বরূপ উন্মোচনের ভেতর দিয়ে আমরা দেখব সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে স্বকীয় হয়ে উঠেছেন। প্রথম জীবনে সমসাময়িক সাংগীতিক ধারাকে আত্মস্থ করে অর্জিত সুরের জটিলতা, বাণীর গাম্ভীর্যকে কাটিয়ে উঠে পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ সহজ ছন্দে বাঁধা সুরের সাবলীলতা, বাণীগত সারল্য ও গভীরতায় তাঁর গানকে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের গানের পরিণতি এক দীর্ঘ শিল্পযাত্রার ফসল। একজন রসাস্বাদনকারী হিসেবে ব্যাপক কাল-পরিসরে সৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টির সুষমায় সুস্পষ্ট বিভাজন আমরা লক্ষ করি। এই বিভাজনটি মূলত প্রভাবিত ও আত্মীকৃত-স্বকীয় রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বিভাজন বাণী ও সুরের নিজস্ব বৈভবে উত্তরণকালের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এই গবেষণায় মূলত পরিণত বয়সের গানের বাণীগত বৈশিষ্ট্য, সুরগত অনন্যতা ও ছন্দগত সুষমা যাচাই করা হয়েছে। পরিণত গান বলতে কী বোঝায়, সেই বিবেচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শেষ জীবনের গানের শৈল্পিক ব্যবচ্ছেদই এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা-পদ্ধতি

উপরিউক্ত শিরোনামের গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা। পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমত্বের ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন। তাঁর অসংখ্য পরিণত বয়সের গান থাকলেও এই গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানগুলির মধ্যে দশটি গান বেছে নেয়া হয়েছে। এই সীমিত সংখ্যক গানের মধ্যে ব্যাপকতার ব্যাঞ্জনা রয়েছে, এমনসব গান নির্বাচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে-সকল গান বাণী, সুর ও ছন্দের সম্মিলনে গবেষকের কাছে প্রবল আস্বাদনযোগ্য, সেই গানসমূহই বিশ্লেষণযোগ্য গান বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়। বিশেষ করে প্রথম জীবনের গান কী এবং শেষ জীবনের গানই-বা কী তা বিবেচনার যেহেতু সর্বজনমান্য কোনো বিভাজনরেখা টানা সম্ভব নয়, তাই এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অভিমতকেই গ্রাহ্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি পরিণত বয়সের রূপাকুল গানের উদাহরণ দিতে গিয়ে ‘কেন বাজাও কাঁকন কনকন ছলভরে’ গানটি নির্দেশ করেছিলেন[১], যা তাঁর ৩৬ বছর[২] বয়সের রচনা। তাঁর ওই বয়সের পূর্ববর্তী কোনো গান বিবেচনায় আনা হয়নি। পরিণত বোধ যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট বয়সের ব্যাপার নয়, তবুও পরিণত বয়সের গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনে ষাটোর্ধ বয়সের গানকে বেছে নেয়া হয়েছে। বিচার্য গানসমূহের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-পূর্বক সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এই গবেষণায়।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন– “প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।”[৩] তাঁর প্রথম জীবনের গান ইমোশনাল, পরিণত বয়সের গান ইসথেটিক। নিজের গান রচনা প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে তাঁর চিন্তার নানান পরিবর্তন হয়েছে এবং তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, “সারাজীবন ধরে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন করে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। আমার মত যদি বদলেই থাকে তাতে আমি ক্ষোভ করি নে। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি– গানের ক্ষেত্রে, শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা না’ই রইল

তবে তা কিছুতেই শিল্পের পাঙ্‌ক্তেয় হতে পারে না।"[৪]তাঁর পরিণত বয়সের গান প্রসঙ্গে *সংগীতচিন্তায়* নানান তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। তবে, তার কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ নেই। শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে গান নিয়ে নানান চিন্তার বিস্তার রয়েছে, কিন্তু পরিণত বয়সের গানকে বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়নি। সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা' প্রবন্ধসংকলনে রবীন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে অনেক তথ্যগত সংবাদ পাওয়া যায়– তাঁর গানের স্বকীয়তা, সাংগীতিক অভিনবত্বের খোঁজ মেলে; পরিণত বয়সের গানকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে কোনো রচনা সেখানে অনুপস্থিত। সুভাষ চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসংগীতায়ন-১' ও 'রবীন্দ্রসংগীতায়ন-২' প্রবন্ধ সংকলনে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও রূপ, তাঁর গানে শব্দের ব্যবহার, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত– এমন নানান প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি' থেকে পরিণত বয়সের গানের তালিকা রয়েছে, বিশ্লেষণ সেখানে সংগত কারণেই থাকেনি। ড. অপূর্ব বিশ্বাসের 'ঋতুসংগীতে রবীন্দ্র-কবিমানস' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গানের বিশ্লেষণ রয়েছে। আলাদা করে পরিণত বয়সের গানকে যাচাই করা হয়নি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'যাত্রাপথের আনন্দগান' গ্রন্থে স্মৃতিকথার মধ্য রবীন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে নানান খবর উঠে এসেছে, পরিণত বয়সের গান প্রসঙ্গে কোনো তথ্য সেখানে পাওয়া যায় না। ওয়াহিদুল হকের 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের তাৎপর্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজিত হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রগানে পরিণতি প্রসঙ্গে কোনো বিবরণ নেই। সন্‌জীদা খতুনের 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, সুর ও ছন্দের বিশ্লেষণ রয়েছে, পরিণত বয়সের গানকে আলাদা করে চিহ্নিত করে বা গুরুত্ব দিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের স্বরূপ ইতঃপূর্বে কোনো গবেষক বা শিল্পরসবোদ্ধা উন্মোচন করে যাননি। ফলে, বিষয় হিসেবে তা অনন্য। অন্তত একটি প্রবন্ধের পরিসরে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হলে, তার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী গবেষকগণ বৃহদাকারে একই বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন। এতে রবীন্দ্রনাথের গানের পরিণত রূপ, রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশের ইতিহাসটি আরো সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়বে এবং সংগীতগবেষণার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হবে।

২

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ তাঁর সংগীতশিক্ষার অনুকূল ছিল। ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয়সংগীত শিক্ষার জন্যে গুরু নিযুক্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার আত্মকথনের প্রথম বাক্যই এমন ছিল– 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না'।[৫] শিশুকাল থেকে সংগীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তাঁর গান শেখা শুরু। তাঁর কাছেই তিনি আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়িয়েছেন।[৬] এছাড়াও তিনি, যদু ভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ শাস্ত্রীয়সংগীতগুরুদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু প্রথাগত সংগীতশিক্ষায় তাঁর মন ছিল না। 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে'[৭], দরোজার 'আড়ালে আবডালে'[৮] যা শিখেছেন তিনি, তা দিয়েই ঝুলি ভর্তি করেছেন। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে নানা সময়ে তিনি গান রচনা ও পিয়ানো চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।[৯]

শিল্পচর্চার অনুকূল ও সংগীতমুখর পারিবারিক পরিবেশে গান রচনা করতে গিয়ে প্রথম জীবনে শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন। আর, বাণীর ব্যাপারটি প্রায় নির্ধারিত ছিল– তা

ঈশ্বর উপাসনার অনুকূল বাণী দিয়ে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে গান লিখতে হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতোই। তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন সংগীতকার হিসেবে পিতার কাছে। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'– গানটি শুনবার পর রবীন্দ্রনাথের পিতা যুবক রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"[১০] পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে বিলেত যাত্রার সুযোগ করে দেয়, যেখান থেকে তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের মিশ্র ধারাকে আমাদের বাংলা গানে সংযুক্ত করেছিলেন। পারিবারিক কারণেই জমিদারি দর্শনের সুবাদে তিনি বাংলা লোকজ গানের নানান ধারায় সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁর নিজের গানেও তার ব্যবহার আমরা লক্ষ করি। পারিবারিক কারণেই তিনি কীর্তনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে এই সকল কিছুর প্রভাবই তাঁর গানে কোনো-না-কোনো ভাবে রয়ে গেছে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতকার হিসেবে অভিজ্ঞতার পরিণতির ফলে তাঁর গানে এইসকল ধারার প্রভাব দুর্লক্ষ হয়ে পড়ে। পরিণত বয়সের কোনো গানকে আলাদা করে শাস্ত্রীয়, বিদেশি, লোক, কীর্তন, প্রাদেশিক প্রভাবযুক্ত গান হিসেবে আমরা আর পাই না। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে যেমন মিশ্র অনুভূতি সঞ্চারিত থাকে– ঈশ্বরের গানে মানবিক মহিমার সম্পৃক্তি পাওয়া যায়, কিংবা প্রেমের গানে ঐশ্বরিক অনুভূতি উপলব্ধ হয়, তেমনই তাঁর পরিণত বয়সের গানের বাণী ও সুরে নানান ধারায় সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ রয়েছে, যার আস্বাদন স্বকীয় রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেয়, আমাদেরকে অনন্য এক বাণী ও সুরের মহিমায় আপ্লুত করে।

৩

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশী কালে রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির গান, ব্রহ্মসংগীত, শাস্ত্রীয়সংগীত ভাঙা গান, পাশ্চাত্য ভাঙা গানসমূহে কখনো-বা মূল গানের ভাষার ধ্বনিবিন্যাস, ছন্দের ঝোঁক, সুরের মহিমাকে বজায় রেখে চলেছিলেন। তাঁর গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া' বিদেশি সুরের অনুসরণে সৃষ্ট হলেও এর বিষয় নির্বাচনে পৌরাণিক কাহিনির নির্ভরতা ছিল। সুরের ক্ষেত্রে বিদেশি সংগীতের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগের ব্যবহার এবং ছন্দের ব্যবহার বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী সময়ে যুবক বয়সে রচিত গীতিনাট্য 'মায়ার খেয়া'য় ভারতীয় সুরের নানান রকম কারুকার্য ছিল। ছন্দের ক্ষেত্রে 'মায়ার খেলা'য় দেখতে পাওয় যায়– বাণীর ঝোঁক এবং সুরের ঝোঁক একসঙ্গে চলছে না। একধরনের কসরৎ ছিল প্রথম দিকের এমন নিরীক্ষাধর্মী রচনায়। নানান আঙ্গিকে গান-রচনার এ নিরীক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। তা আমরা নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'র গানের বাণী ও সুরের বিন্যাস লক্ষ করলে বুঝতে পারি। শেষ জীবনের এই দুটি রচনা বাণী ও সুরের বিন্যাস অনেক সরল। উল্লেখ্য, 'চণ্ডালিকা'র পুরোটাই গদ্যে ঢালা। সুরের মহিমায় নিপাট গদ্য কী করে গান হয়ে উঠতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে 'চণ্ডালিকা'কে দাঁড় করানো যায়। যেখানে সুরের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধারার প্রভাব আমরা চিহ্নিত করতে পারি না।

তাঁর প্রথম বয়সের গানে ধ্রুপদের প্রভাব ছিল প্রকট। মূল ধ্রুপদের সুরের আদলে যেমন ভাঙা গান রয়েছে, তেমনই ধ্রুপদকে কেন্দ্র করে ধ্রুপদাঙ্গ গানও রয়েছে। শেষ বয়সের গানে বাণীগতভাবে

ধ্রূপদের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের চার তুকের বিন্যাস থাকলেও সুরের দিক থেকে ধ্রূপদের গাম্ভীর্য সর্বাংশে বজায় থাকেনি। শেষ বয়সের গানসমূহে পাশ্চাত্য সুরের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সুরের ক্ষেত্রে বাউল ও কীর্তনের যুগপৎ ব্যবহার শেষ বয়সের কোনো কোনো গানে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইসব গানে উচ্ছলতা কম। পরিণত বয়সের অধিকাংশ গানে কোথাও একটা বিষণ্নতা থেকে যায়।

প্রথম বয়সের গানে দুরূহ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে– 'চৌতাল', 'আড়াচৌতাল', 'ত্রিতাল', 'ধামার', 'একতাল', 'যৎ', 'ঝাঁপতাল', 'তেওড়া' এর মধ্যে অন্যতম। মধ্য বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত 'ষষ্ঠী', 'অর্ধঝাঁপ', 'ঝম্পক', 'রূপকড়া', 'একাদশী', 'নব তাল', 'নবপঞ্চ তাল' ব্যবহার করেছেন সংগীতের মুক্তির প্রয়োজনে। এছাড়া বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে দুই-দুই, দুই-চার, চার-দুই, দুই-তিন, তিন-ছয়, নয়মাত্রার টানা ছন্দ, এবং দুই-চার দুই চার ছন্দের ব্যবহার রয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত তালের মধ্যে 'ষষ্ঠী' তালকে তিনি শেষ বয়স পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। পরিণত বয়সে তিন-তিন, চার-চার ছন্দের ব্যবহার বেশি। অর্থাৎ, ছন্দগত দিক থেকেও জটিলতাকে এড়িয়ে তিনি সারল্য এনেছিলেন ছন্দ প্রয়োগে– বাণী ও সুরকে নির্ভার করবার প্রয়োজনে।

এবার আমরা পরিণত বয়সের প্রতিনিধিত্বশীল দশটি গান বিশ্লেষণ করব, যার মধ্য উঠে আসবে পরিণত বয়সের গানের বাণী, সুর ও ছন্দের স্বরূপ–

রবীন্দ্রনাথের ৬১ বছর বয়সে রচিত[১১]গান 'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি'[১২]। নির্মলকুমারী মহালনবীশ বলেন– আদ্রে কর্পেলস যেদিন শান্তিনিকতন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন সেইদিন রচিত হয় এই গানটি।[১৩]গানটির উপলক্ষ বিদায়ের ব্যাকুলতা– বাণীতে বিরহ, বিষাদ ও সারল্য আমরা দেখতে পাই। এই বিদায়ের সঙ্গে চলে যাওয়া ব্যক্তিটির পাথেয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথের অমোঘ বাক্য– "যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা– নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা"। বিদায় শুধু বেদনাই নয়, অন্তর্গত ঔজ্জ্বল্যে মহিমাময় হয়ে উঠেছে গানের বাণীতে। এবার গানের স্থায়ী অংশের সুর আমরা লক্ষ করি–

I I{-া -া সা। সগা গা -া I -া -া গা। গা গমা -রা I

০ ০ ভ রা০ থা ০ ০ ক্ ভ রা থা০ ০

I(-পা -া -া। -া -া -াI

০ ০ ০ ০ ০ ক্

...

পা। না না -া I

মি ল নে র্

I না ধা -না। না র্র্সা -না I ধপা -া পা।পর্সা র্সণা -া I

উ ০ ৎ স বে০ ০ তা০ য় ফি রা০ য়ে ০

I ধা পা -গ পা।পমা গা -া II[১৪]

দি য়ো ০ ০ আ নি ০

উল্লিখিত সুরে আমরা দেখতে পাই 'ভরা' শব্দটির সুরে ষড়জ থেকে ষড়জ-গান্ধারের সুরের প্রয়োগ রয়েছে, যা শব্দটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। 'থাক্' শব্দটির আট মাত্রা ব্যাপী সুরে বিন্যাস যেন স্মৃতিকে চিরস্থিতি প্রদান করেছে। 'বিদায়ের পাত্রখানি'র সুরে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এক বেদনাঘন আবহ নিয়ে এসেছে। স্থায়ী অংশের 'ফিরায়ে' শব্দটির সুরে কোমল নিষাদ যেন ব্যথাতুর হৃদয়কে বিবৃত করছে। আমরা জানি, কোনো সুরই রাগবহির্ভূত নয়। সুনির্দিষ্ট কোনো রাগে বাঁধা না হলেও, পরিণত বয়সের গানে বিভিন্ন সুরসংগতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। কখনো একটি রাগের সংগতি, কখনো-বা একাধিক রাগের সংগতি রয়েছে তাঁর গানে। ভাবের রসনিষ্পত্তির প্রয়োজনে এমনটি করা হয়েছে বলে মনে করা যায়। আলোচ্য গানটির স্থায়ী অংশে বেহাগের ছায়া; অন্তরা ও আভোগের শেষাংশে ছায়ানট রাগের সংগতি বিদ্যমান।

তিন-তিন ছন্দের সরল বিন্যাসে নিরাভরণ এই গানটি অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের যৌক্তিক ব্যবহার বিদায়ের লগ্নকে প্রকৃতিগত ভাবে উপস্থাপন করে।

৬২ বছর বয়সে রচিত[১৫] গান 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে'[১৬]। এই গানের বাণীতে আমরা লক্ষ করি, পুনরুক্তি দিয়ে গানকে সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভিন্নভিন্ন সুরে 'যখন এসেছিলে' কথাটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এটি মূলত ভ্রষ্টলগ্নের গান। 'অজানা' যাকে বলছেন কবি, তাকেই অনুভবে জেনেছিলেন তিনি, প্রাণে পরশ পেয়েছিলেন সেই অজানার। অথচ, দেখা তার মিলল না, পড়ে রইল পথে কণ্ঠহার। পতিত কোনো মালায়ও প্রত্যাশিত নিবেদন সম্পন্ন হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য এই গানে আমরা জানতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত বাণীর বিন্যাস থেকে এই গানের বাণী একটু আলাদা হয়ে যায় সুরের বিন্যাসের কারণে। 'যখন এসেছিলে' কথাটি যখন দুইমাত্রা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় মাত্রায় শুরু হয়, তখন আলাদা একটা ঝোঁক তৈরি হয়। ফলে, 'সিন্ধুপারে' আসবার খবরটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন 'সিন্ধুপারে' বুঝি-বা চাঁদ ওঠেনি, এমনটি মনে হয়, যা বাণীর লক্ষ ছিল না। ঝোঁককে বজায় রাখতে গিয়ে, এবং পুনরুক্তির কারণে উদ্দিষ্টই [যে আসে অন্ধকারে] প্রধান হয়ে ওঠে এই গানে–

II -া -া সা । রা -া। সা -রা I ন্া -া -সা। র্া -জ্ঞা। রা -া I

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে ০

I -রা -পা মা। জ্ঞা -রা। সা -রা I ন্া -সা রা। রা -পা। মজ্ঞা -া I[১৭]

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে০ ০

তিন-দুই-দুই ছন্দের কারণে বাণীর ঝোঁক আর সুরের ছন্দের ঝোঁক যদি একাকার করা যায়, তবেই এই সরল গানটি সার্থকতা পেতে পারে। সচরাচর ঝোঁককে প্রধান্য দেবার প্রবণতা গানের রসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। পরিণত বয়সের এই গানে দারুণ এক প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে যে মানবমহিমা

তা একক নয়, যেন ঈশ্বাভিমুখিতা রয়েছে সেখানে। দেখা পাওয়া যায় না আঁধারের ঘোরে, সেই প্রত্যাশিত জনের, যার ফেলে যাওয়া মালা পরম ধন হয়ে ওঠে মানব-জীবনে। পুরো গান জুড়ে অসংখ্য বার কোমল গান্ধারের ব্যবহার রয়েছে, আর অন্তরায় ও আভোগে একাধিকবার কোমল নিষাদের ব্যবহার রয়েছে– যা বাণীর ব্যাকুলতাকে যথাযথভাবে ধারণ করেছে। পিলু রাগের স্বরসংগতির সঙ্গে এই গানের স্থায়ী ও অন্তরার সুরবিন্যাসের মিল রয়েছে। বাণী ও সুর মিলিয়ে এক অনন্য রূপ লাভ করেছে এই গান। মিড়যুক্ত স্বরের বাইরে সরলভাবে বিন্যস্ত কিছু সুর রয়েছে এই গানে, যেখানে না চাইলেও মিড়ের একটি আবহ চলে এসেছে। যা রবীন্দ্রনাথে শেষ বয়সের অনেক গানেই লক্ষ করা যায়।

৬৩ বছর বয়সে রচিত[১৮] গান 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'[১৯]। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের বিশুর গাওয়া গান এটি। ঈশ্বরাভিমুখি এক অপার নৈঃসঙ্গ্য ও বেদনা এই গানে জেঁকে বসেছে, যদিও গানটি 'প্রেম' পর্যায়ের গান হিসেবে *গীতবিতানে* চিহ্নিত। এই মিশ্র অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের অধিকাংশ গানেরই বৈশিষ্ট্য। চেনা জগতের এক অচেনা আবহে আমাদেরকে পৌঁছে দেয় 'রক্তকরবী'র এই গান। এবার গানের সুরটি আমরা লক্ষ করব–

I I সা সা -া -া। -া -া সা রাI ণ্সা -ণ্া সা সা ।-ণ্সা -রজ্ঞা -রা -া I

চো খে ০ ০ ০ র্ জ লের্ লা০ গ্ ল জো ০০ ০০ য়া র্

...

Iরা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা। সরা রসা -গা -া Iসা গা মা পা।-পধপা -মগা -রগা -মপা I

আ কু০ ০০ ০ল্ আ০ লো ০ য় দি শা হা রা ০০০ ০০ ০০ ০০

I গা মা -া -া। -া -া -া -া I[২০]

রা তে ০ ০ ০ ০ ০ ০

এই গানের গ্রহস্বর ষড়জ হওয়ায় প্রথমেই একটা স্থিরতার বোধ নিয়ে আসে, তারপর ক্রমে টপ্পার দানায় ভর করে গানটি ডানা মেলতে থাকে। স্থায়ী অংশের কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার বাণীর ব্যথার আবহকে নিশ্চিত করে। পুরো গানজুড়ে ঘুরে ফিরে এসেছে এই কোমল নিষাদ আর কোমল গান্ধার। কাফি রাগের স্বরসংগতি রয়েছে এই গানে। গানটি বক্তব্য-নির্ভর, যেন একটি নির্মম ঘটনার বিবরণ দেওয়াই এর লক্ষ্য। অন্তরার দ্বিতীয় চরণ 'তারে হাওয়ায় হাওয়ার নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে', আভোগের দ্বিতীয় চরণ 'দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে

অন্ধকারে’ সুরের বিন্যাসে দুমড়ে মুচড়ে দেয় আস্বাদনকারীর হৃদয়; বিষাদমথিত করেই তা শিল্পিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ৬৪ বছর বয়সে রচিত[২১]গান ‘গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে’[২২]। প্রকৃতির এই গানে এক ধরনের objective correlation তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃতিকে মানবিক করে তোলা হয়েছে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের এটাও এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এবার, গানের সুর আমরা লক্ষ করি–

II সা সণা ণা ।ণধা -পা -াI পক্ষা -পা ক্ষধা । ধপা -মা -জ্ঞাI

গ হ০ ন রা তে ০ শ্রা ব ণ০ ধা রা ০

Iগরা রপা মা। গা -রা -গাI সা -া -রা । রা -া -গা I

প ড়ি ছে ঝ রে ০ কে ০ ০ ন ০ ০

Iগরা -া গমা । মা -মা -গাI গরা -া -গা । গরা -া -পাI

গো ০ ০০ মি ছে ০ জা ০ ০ গা ০ ০

I মগা -পমা -গা। রগা -রসা -াII[২৩]

বে০ ০০ ০ ও০ রে ০

স্থায়ীর প্রথম চরণে কোমল নিষাদ ও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এবং দ্বিতীয় চরণে ‘কেন’ ও ‘জাগাবে’ শব্দটিতে মিড়ের ব্যবহার প্রশ্নাকুলতায় ভরা। স্থায়ী অংশের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে এই গানে। গৌড়মল্লার রাগের স্বরসংগতি এই গানে প্রচ্ছন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ গাইবার পর স্থায়ী অংশে ফিরবার একটা তাগিদ রয়েছে গানটিতে। শেষ জীবনের গানের এই অভিনব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে অনন্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৫ বছর বয়সে রচিত[২৪] গান ‘আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে’[২৫]। শরৎ প্রকৃতির এই গানটিও পূর্ববর্তী গানের মতোই প্রকৃতি যেন মানবের মতোই সক্ষমতা নিয়ে বিরাজ করছে। শুভ্র এক সকালের নিখাদ সৌন্দর্যই কেবল বিবৃত হয়েছে গানটিতে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির বাইরে কোনো মানবের সম্পৃক্ততা এই গানে নেই। কেবল সৌন্দর্যের অভিঘাতের বিবরণটুকুই সারল্য আর গভীরতায় চিহ্নিত হয়েছে গানটিতে। এবার আমরা গানের সুরটি লক্ষ করব–

মা -া পাII -গা -মা -দা । -দপা -ণা -ণদাI পা -া -া । পা -দা পাI

আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ র্ অ ম ল

I মা পা পা ।পদা -ণদা-পাI মগা -া -া । গপা -া -াI

ক ম ল খা০ ০০ ০ নি০ ০ ০ কে০ ০ ০

I সা -ঋা -গা । -মা -পা -দাI -মা -পা -দা । -না -র্সা -র্ঋাI

কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্ঋর্সা -া -র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা -র্সা -াI ণা -া -দা । দা -পা -মাI

০ ০ ০ ফু টা ০ লে ০ ০ আ ০ ০

I -গা -মা -দা । -দপা -ণা- ণদাI পা -া -া । -া -া -াI[২৬]

০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ র্

স্থায়ী অংশে ‘আলোর’ কথাটি তালের দুইটি পূর্ণ আবর্তন জুড়ে রয়েছে। যেন বিস্তৃত রূপে দেখা আলোয় চিত্ত ঝলমল করে উঠেছে। কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ, কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধারের ব্যবহার শরতের সকালের শুভ্রতাকে প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। সুনির্দিষ্ট কোনো ভৈরবের স্বরসংগতি এখানে নেই, তবে ভৈরব অঙ্গের রাগের স্বরের সঙ্গে এই গানের স্বরসমূহের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই গানের কোথাও একটি মিড়ও নেই, অথচ এই গানে অলক্ষ মিড় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। পরিণত বয়সের গানে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সুরের বিন্যাস এবং তিন-তিন ছন্দের সহজ বিন্যাস তাঁকে স্বকীয় করেছে, যা প্রথম বয়সের গানসমূহে অনুপস্থিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ৬৬ বছর বয়সে রচিত[২৭] গান ‘গোধূলীগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা’[২৮]। প্রেমের এই গানে বর্ষাপ্রকৃতির আবহ ও বিষণ্নতা বিদ্যমান। বর্ষাপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে বিরহ-বেদনার উন্মোচন রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অন্তরার ‘হয়ত সে তুমি শোনো নাই’, আভোগের ‘আর কি কখনো কবে’ বাণীর মতো একই সুরে বিন্যস্ত হলেও ভাবনা আলাদা– একটিতে সংশয় অপরটিতে প্রশ্নাকুলতা রয়েছে। গানের সুর এবার লক্ষ করব–

II { সা সণা ধণা। ধা ধাধ ণধাI পা -ক্ষা -ধা । পা -া -রাI

গো ধূ০ লি০ গ গ নে০ মে ০ ০ ঘে ০ ০

Iরা গরা গা । মা মা -গাI গা -া -পা । -া -া -াI

ঢে কে০ ছি ল তা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

...

I^স^পা পা পা । পক্ষা পক্ষা পক্ষা Iপধা পা ^-প^ধধপা । -মা -া -াI

আঁ ধা রে নী০ র০ ব০ ব্য০ থা ০০০ ০ ০ ০

I^স^মা মা মা । মা মা -গাI গা -া -পা । -া -া -া}I[২৯]

দি য়ে ছি ল ঢা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০

স্থায়ীর শুরুতেই ‘গোধূলী’ অংশের সুরে এক মাত্রার বিন্যাসেই মনে হয়, যেন-বা এতে মিড় রয়েছে, যদিও তা অনুপস্থিত। কোমল নিষাদ, তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এবং মিড়ের আধিক্য গানটিকে সরস করেছে। ছায়ানট রাগের স্বরসংগতি প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে গানটিতে। এই গানের রূপাকুল বাণী, অসামান্য সুর ও তিন-তিন ছন্দের সরল বিন্যাস অপরূপ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের ৭২ বছর[৩০] বয়সে রচিত গান ‘পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়’[৩১]। গানের বাণীতে যুগপৎ সারল্য ও গভীরতা রয়েছে। নিরুদ্দেশ মানবযাত্রার যে পথ, তার শেষে কী রয়েছে তা অজানা থেকে যায় মানুষের। এই পথ মরীচিকাময়, তবু পথ চলবার তৃষ্ণা মেটে না। পথের অন্ধকারে ও বিভ্রমে মানবের অশ্রুভার বয়ে বেড়ানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না– তা কেবল বেদনাই বয়ে আনে। এইগানের সুর আমরা লক্ষ করি–

I I রসা -রা রপা -া ।-া -া -া -াI র্সা -না র্সা না । র্সা -া -ণা -ধা I

প০ ০ থে০ ০ ০ ০ ০ র্ শে ষ্ কো ০ থা ০ ০ য়্

I ণা -ধা ণা -ধা । ণা -া -পা -মাI পা -া -র্সা -া । ণা -ধা পা -া I

শে ষ্ কো ০ থা০ ০ য়্ কী ০ ০ ০ আ ০ ছে ০

I মপা -ধপা ^ম^জ্ঞা -া ।রসা রা রপা -াI -া -া -া -া । -া -া -া -াI[৩২]

শে০ ০০ ষে ০ প০ ০ থে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

এই গানে কোনো কোনো স্বরে শব্দের শেষ ধ্বনির স্থিতিকাল ছয় মাত্রা জুড়ে, কখনো-বা দশ মাত্রা জুড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এমন সুরবিন্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে বিরল। কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যমের ব্যবহার বেদনাবাহী বাণীকে অধিকতর বিষণ্নতায় ভরিয়ে তোলে। গানটির সুরে কাফি রাগের সংগতি পাওয়া যায়। এটিচার-চার ছন্দের আট মাত্রার আবর্ততের গান হলেও, বাণী ও সুরের অভিনব সম্মিলনে একে দীর্ঘ ষোলো মাত্রার

আবর্তন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গান এভাবেই সারল্যকে ধারণ করে বাণী, সুর ও ছন্দে অভিনবত্ব লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের ৭৩ বছর বয়সে রচিত গান[৩৩] 'কাছে থেকে দূর রচিল'[৩৪]।এই গানটিও বাণীর সারল্যে উত্তীর্ণ এক প্রেমের গান। মানব-মানবীর প্রেমকে সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে গানটিতে। পাওয়া এবং না-পাওয়া যুগপৎ মিলেমিশে আছে যেন। প্রেমময় মিলন তাই কবির হৃদয়কে বিরহের কারাগারে বেঁধে রেখেছে। প্রিয় মানুষকে জানা কখনো-বা না-জানার সমার্থক হয়ে যায়– এই আশ্চর্য কথাই গানটির মর্মে রয়েছে। কাঙ্ক্ষিতকে পেয়ে হারানো বোধ জীবনকে সম্পূর্ণ হতে দেয়নি, 'আধা' করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গানগুলি এভাবেই গভীরতাকে সরলপথে তুলে এনেছে আস্বাদনকারীর কাছে। এবার গানের সুর আমরা লক্ষ করব–

[রা রসা সন্া]

II{ সা সা সা । সন্া সা -পাI মা জ্ঞরা সা । -া -া -াI

কা ছে থে কে০ দূ র র চি০ ল ০ ০ ০

I (সগা গা গা । মা পা -ধা I মা -পা -মা । জ্ঞা -মা -গা)}I

কে ন গো আঁ ধা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

...

I (সা পা পা । পা পা ধাI ধর্সা র্সা -ণা । ধা পা -ধাI

জা নি তা রে আ মি ত০ বু ০ তা রে ০

Iমপা মগা -া । মা -া পাI পমা -জ্ঞা -া । -া -া -রসা)} I[৩৫]

না হি ০ জা ০ নি যে ০ ০ ০ ০ ০০

স্থায়ী অংশে উহ্য মীড় আমরা দেখতে পাই প্রথম চরনের 'দূর' শব্দটির সুরবিন্যাসে। 'আঁধারে' অংশের সুরে ভিন্নভিন্ন স্বর ঘুরে ঘুরে সুরের চলন যেন অন্ধকারকেই প্রকটিত করেছে। আভোগের 'বাহিরে হারাই' কথাটির শেষাংশের সুর তালের দুই আবর্তন জুড়ে আছে যার বিন্যাস হাহাকার তৈরি করে। কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের ব্যবহার পুরো গানটির মধ্যেই বেদনা বিছিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানে ব্যকুল বেদনা প্রকাশ করতে কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা এর আগেও লক্ষ করেছি। এই গানে তা আরো প্রবলভাবে বিদ্যমান। মালগুঞ্জি রাগের স্বরসংগতি এই গানে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তিন-তিন সরল ছন্দে বিন্যস্ত গানটি চটুল নয়, বাণীর

প্রয়োজনেই এই গানের ছন্দের মধ্যে বিশেষ ধরনের স্থিরতা আমরা লক্ষ করি, যা পরিণত গানের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের ৭৭ বছর বয়সে রচিত[৩৬] গান 'প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে'[৩৭]।অখণ্ড *গীতবিতানের* ভূমিকা হিসেবে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে এই গান। ফলে, বাণীগতভাবে এই গানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমাংশের বাণীতে প্রকারান্তরে নিজেকেই যেন 'নবসৃষ্টির কবি' এবং 'নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি তাঁর জীবনদেবতার কথা বলেছেন, যিনি 'অবাক আলোর লিপি' তাঁর কাছে বয়ে এনেছেন। সেই 'অপূর্ব একা'র সঙ্গে শেষ বয়সেও 'নবপরিচয়' ঘটেছে যেন। এবার গানটির সুর আমরা লক্ষ করব–

II ন্সা সা সা । রা রা রাI রা রা রা । রা রা -সাI
প্র০ থ ম যু গে র উ দ য় দি গ ঙ্
I রা মজ্ঞা -া । -া -া -মা I
গ নে০ ০ ০ ০ ০

...

I মা পা পা । পা পা -ণাI ণা ণা ণধা । পা -ধণা ণাI
ব হু জ ন তা র্ মা ঝে অ০ পূ ০র্ ব
I[ণ]ধা পা -া । -া -া -ধপাI মা মগা গা । -া গা সাI
এ কা ০ ০ ০ ০০ যে জা০ গা য়্ চো খে
Iসা গা গা । মা পা ধপাI মগা মা -া । -া -া -াI[৩৮]
নূ ত ন দে খা র০ দে০ খা ০ ০ ০ ০

স্থায়ী অংশে প্রথম চরণের 'প্রথম' শব্দটিতে শুদ্ধ নিষাদ ও ষড়জ হয়ে শুদ্ধ ঋষভে আট মাত্রার স্থায়িত্ব এবং কোমল গান্ধার হয়ে মধ্যম দিয়ে শেষ হওয়ায় গানটি প্রথম থেকেই এক ধরনের ধ্রুপদীয় দাপট অর্জন করেছে, যদিও তা ধ্রুপদ নয়। অন্তরা ও আভোগে কোমল নিষাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।কাফি-কানাড়ার স্বরসংগতি গানটিতে বিদ্যমান। এ গানে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির সর্বপ্রান্তস্পর্শী রহস্য, সরল ভাষার অসামান্য তাৎপর্যসহজ সুরের বিন্যাসে নিয়ে বিরাজ করছে। উপরিউক্ত অপরাপার গানে কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদের ব্যবহার যেমন করে বেদনাবাহী হয়েছিল, এই গানে তেমনটি আমরা দেখতে পাই না। মধ্য লয়ে গেয় এই গানটিতে তিন-তিন ছন্দের ব্যবহার রয়েছে। দীর্ঘ এই গানের স্বরলিপিতে মিড়ের ব্যবহার খুব কম, তবু গাইবার সময় অদেখা মিড় এসে প্রায় প্রতিটি চরণেই লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারটি পরিণত বয়সের গানের প্রধান লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ৭৭ বছর বয়সে রচিত[৩৯] গান 'সমুখে শান্তিপারাবার'[৪০]। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় গাইতে বারণ ছিল। কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে সাধারণের সামনে গানটি পরিবেশিত হয়। বাণীগত তাৎপর্য বিবেচনা করতে গেলে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিমে লিখিত এই গানে কবি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু দার্শনিক প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রথাগতভাবে ভয় কিংবা বৈরাগ্য মানুষের মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেন তা ব্যতিক্রম– 'শান্তিপারাবার'। তাঁর কাছে মহা 'অজানা' যেন ক্রমান্বয়ে জেনে ওঠা– এক ধরনের সদর্থক অনুভূতি নিয়ে সম্পূর্ণ গানে বিরাজ করছে। এবার গানের সুর লক্ষ করব–

I I সা রা গা -া। গা -পা পা -াI পা -ক্ষা ধপা -ক্ষা। গা -মা -গা -া I

স মু খে ০ শা ন্ তি ০ পা ০ রা ০ বা ০ ০ র্

I গা -ক্ষা পা -া। ক্ষপা গক্ষা গা -ঋাI গা -পা গা -ঋা। গা -ঋা সা -া I

ভা ০ সা ও ত০ র০ ণী ০ হে ০ ক র্ ণ ০ ধা র্

...

I I সা -রা গা -পা। গা -গরা সা -াI সা রা গা ক্ষা।পা -া -া -া I

মু ক্ তি ০ দা ০ তা ০ তো মা র ক্ষ মা ০ ০ ০

I ক্ষা পা ধা ধা। ধনা -া -ধা -পাI পা ধা না র্সা। র্সা র্গা র্রা র্সনা I

তো মা র দ য়া ০ ০ ০ হ বে চি র পা ০ থে য়০

I ধা পক্ষা ধপা -পক্ষা। গা -া -া -াI[৪১]

চি র০ যা ৎ ত্রা ০ ০ র্

স্থায়ী অংশের সুরে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এবং পর্যায়ক্রমে কোমল ঋষভের পুনঃপুন ব্যবহার সরল সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য পুরে দেয়। স্থায়ী অংশে যুগপৎ ইমনকল্যাণ ও পূরবী রাগের স্বরসংগতি লক্ষ করা যায়। গানের মধ্যে মিড়ের প্রাধান্য নেই, অথচ স্বরের প্রয়োগের কারণে এই গানে অনায়াসে মিড় চলে আসে। কিন্তু সঞ্চারীতে 'তোমার ক্ষমা' বলবার সময় পঞ্চমে চারমাত্রাব্যাপী ন্যাশ যেন প্রার্থনাকে প্রকট করে তোলে। আভোগের 'বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়' অংশের সুরে প্রসারিত বাহু স্বরের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে যেন। গানের শেষাংশে 'অজানা' শব্দের সুরে অপার্থিব প্রতীতি জেগে ওঠে, সেই সুর নিজের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করে। চার-চার ছন্দের গানের প্রতিটি মাত্রাই আলাদা

করে প্রাধান্য পায় এই গান গাইবার কালে। এই গানে নিজেকে নিঙড়ে দিয়েছেন বাণী, সুর ও ছন্দের সুষমায়। আমরা সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন এক সফল রসস্রষ্টাকে পেয়ে যাই অন্তিমে রচিত গানে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গানের এক সার্বভৌম প্রতিভা। তাঁর গীতরচনার স্বাতন্ত্র্য বাংলা গানের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিণত বয়সের গানে আমরা লক্ষ করেছি, প্রথম জীবনের গানের সকল প্রভাবকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। প্রথম বয়সের গানে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয়সংগীত, পাশ্চাত্যসংগীত, লোকসংগীত, কীর্তন, প্রাদেশিক এমন নানান ধারার প্রভাব ছিল। সাংগীতিক বোধের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই প্রভাব অতিক্রম করে অনন্য হয়ে ওঠেন। উপরিউক্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, গীতরচনার প্রথম দিকের জটিল সুর ও বাণীর আবহ কাটিয়ে পরিণত বয়সের গান সারল্য আর গভীরতায় আস্বাদনকারীর মন ভরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যমতে প্রথম জীবনের গানের 'ইমোটিভ' দশা থেকে শেষ জীবনের গানে 'ইস্‌থেটিক' দশায় উত্তরণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'রূপ' দেবার কথা পরিণত বয়সের গান সম্পর্কে বলেছেন, তা যথার্থ। গান বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, সেখানে ভাবের কোনো ভারিক্কি নেই, নিরাভরণ রূপের প্রকাশ রয়েছে সেইসব গানে। পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজের গান সম্পর্কে বলেছেন, "...আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই 'প্রভূত' কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়– অতি সূক্ষ্ম, অতি সরল ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে"[৪২]। তাঁর পরিণত বয়সের গানগুলি এই বোধেরই অনুপুঙ্খ রূপায়ণ। ফলে, অনিবার্যভাবেই সারল্য, রূপময়তা আর গভীরতায় অনন্য ও ভাস্বর হয়ে ওঠে পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসংগীত।

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৯), পৃ. ১৭২

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি* (কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৩), পৃ. ২০১

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৪ তদেব, ১১৭

৫ তদেব, ১৭৫

৬ তদেব, ১৭৭

৭ তদেব, ১৭৭

৮ তদেব, ১১৮

৯ তদেব, ১৭৮-১৭৯

১০ তদেব, ১৮৬

১১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২০১

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৮০), পৃ. ৩৬৬

১৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.২০১

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতমালিকা* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ২০

১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতমালিকা* প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৬), পৃ. ১৫১

১৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৭),পৃ. ৩৬–৩৭

২১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৬

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতমালিকা* দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫

২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৭), পৃ. ৯৮

২৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪

২৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* অষ্টপঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ৩৮–৩৯

৩০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২

৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*ষট্পঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৭), পৃ. ৪০

৩৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রথম* খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২–১৪৩

৩৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১ [ভূমিকা]

৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ঊনষষ্টিতম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, ১৩৭১), পৃ. ৫–৮

৩৯ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬৬

৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* পঞ্চপঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ৪৪–৪৫

৪২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, তদেব, পৃ. ১১২

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২৩